بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মোতাবেক ১৬ ফাতাহ ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

দোয়া সম্পর্কে বহু মানুষ প্রশ্ন করে থাকে। আজকাল বিশেষভাবে খোদা তা'লা এবং দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যখন কিনা রীতিমতো একটি পরিকল্পনার আওতায় নাস্তিকতার সমর্থকরা খোদা তা'লার সত্তা ও ধর্মের ওপর পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে খোদা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শয়তান মানুষের সাথে সহানুভূতির ছলে তাকে ধর্ম ও খোদা তা'লা থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের (জামা'তের) লোকদের ওপরও কোনো কোনো স্থানে কখনো কখনো এসব শয়তানী চিন্তাধারা প্রভাব ফেলে অথবা জগৎপূজারি ও ধর্মদ্বেষীদের কথা তাদের মাঝে ধর্ম সম্পর্কে, খোদা তা'লা সম্পর্কে এবং ইবাদত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। যারা স্বল্পজ্ঞানী তাদের হৃদয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়। কখনো কোনো পরীক্ষায় নিপতিত হলে বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও স্বল্পজ্ঞান রাখে এমন লোকদের মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, হয় ধর্মই ভ্রান্ত যার ওপর আমরা প্রতিষ্ঠিত আর আসলে এর কোনো বাস্তবতা নেই, অথবা খোদা তা'লার সত্তা এমন নয় যে, দয়া প্রদর্শন করে তিনি দোয়া শুনবেন এবং আমাদেরকে এই বিপদ ও পরীক্ষা থেকে মুক্ত করবেন। অথবা খোদা তা'লা নাঊযুবিল্লাহ্ আমাদের প্রতি অন্যায় করছেন, তাই আমরা এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; দোয়া করা সত্ত্বেও আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হচ্ছে না। মোটকথা কারো কারো মনমস্তিষ্কে এ ধরনের বহু প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। বিশেষত তাদের (মনমস্তিষ্কে) যাদের দৃষ্টি কেবল জাগতিক বিষয়াদির প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কেউ কেউ আমার কাছে লিখে থাকে বা নিজের অবস্থা তুলে ধরে প্রশ্ন করে থাকে। তখন এমন মনে হয় যে, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি সেই ঈমান নেই যা থাকা উচিত। এছাড়া যে পরিবেশে তারা বসবাস করছে সেখানে অবস্থান করার সময় তাদের যদি সামান্য পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয় তাহলে (তাদের মাথায়) নেতিবাচক চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়ে যায় বা সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে থাকে। অথচ তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া। এটি দেখুন যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা করছি; আমরা কতটা নিজেদের ইবাদতকে ধীরেসুস্থে সুন্দর করে আদায় করার চেষ্ট করছি; আমাদের দোয়ার মানকে আমরা কতটা উন্নত করেছি; আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে।

যাহোক আজ আমি দোয়ার বিষয়টিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে বর্ণনা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা ও নির্দেশাবলীর মাঝে এ সম্পর্কে বহু বিষয় আমরা দেখতে পাই (যা তাঁর) বইপুস্তকে রয়েছে। যাহোক কিছু কথা আমি তুলে ধরব যার মাধ্যমে দোয়ার বাস্তবতা, এর রীতিনীতি, আমাদের দায়িত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত হয়, বরং

নিশ্চিতভাবে তা সুস্পষ্ট হয়। সুসময়েও আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং দোয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যেন বিপদের সময়ও আমাদের দোয়া গ্রহণ করা হয়– এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা (বর্ষিত হয়) যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও সেভাবেই ভয় করে যেভাবে বিপদ আসলে ভীত হয়। যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় খোদা তা'লাকে ভুলে না আল্লাহ্ তা'লাও তাকে বিপদের সময় ভুলে যান না। এছাড়া যে ব্যক্তি সুসময়কে বিলাসিতায় কাটায় আর বিপদের সময় দোয়ায় রত হয় এমন ব্যক্তির দোয়াও গৃহীত হয় না। যখন ঐশী শাস্তি আপতিত হয় তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব সে ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যে ঐশী শাস্তি আসার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকে, সদকা প্রদান করে এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর সম্মান করে আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। নিজের আমলকে সাজিয়ে গুছিয়ে আদায় করে। এটিই সৌভাগ্যের চিহ্ন। তিনি (আ.) বলেন, বৃক্ষ তোমার নাম কী- ফলে পরিচয়, এই নীতির অধীনে সৌভাগ্যবান ও হতভাগা ব্যক্তিকে চেনাও সহজ হয়ে থাকে।

অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনের কাজ হলো নিজের সুসময়েও খোদা তা'লার প্রাপ্য এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকারকে কখনো ভুলে না যাওয়া। কিন্তু সে যদি উক্ত অধিকার প্রদান করে তাহলে বিপদের সময় খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে মুক্ত করেন এবং তার দোয়া গ্রহণ করেন। অতএব এটি একটি মৌলিক নীতি যে, আমাদের কখনো নিজেদের ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে অলস হওয়া উচিত নয়। জাগতিক ব্যস্ততা যেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদান করা থেকে বঞ্চিত না রাখে। অতঃপর খোদা তা'লার কাছে যাচনার সময় কীরূপ অবস্থা হওয়া উচিত আর এর রীতি বা পদ্ধতি কী আর এ রীতি বা পদ্ধতি খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদেরকে কীভাবে শিখিয়েছেন– এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

খোদা তা'লার কাছে চাওয়ার জন্য আদব বা শিষ্টাচার থাকা আবশ্যক। আর বুদ্ধিমানরা যখন বাদশাহ্‌র কাছে কিছু চায় তখন সর্বদা শিষ্টাচারকে দৃষ্টিপটে রাখে। এ কারণেই খোদা তা'লা সূরা ফাতিহায় শিখিয়েছেন যে, কীভাবে চাইতে হবে? আর এতে শিখিয়েছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ সকল প্রশংসা খোদা তা'লারই যিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করো। তিনি اَلرَّحْمٰنِ অর্থাৎ চাওয়া ও যাচনা করা ছাড়াই দান করেন। এরপর তিনি اَلرَّحِيْمِ অর্থাৎ মানুষের সত্যিকার পরিশ্রমের জন্য তাকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করেন। **'সত্যিকার পরিশ্রম'** শব্দটি একটি লক্ষণীয় শব্দ। আল্লাহ্ তা'লা রহীম, তিনি সত্যিকার পরিশ্রমের ফল প্রদান করেন বা প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর সত্যিকার পরিশ্রমের মান হলো তা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার পথে এক প্রকার জিহাদ করতে হয়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, তিনি مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি তাঁরই হাতে; চাইলে জীবিত রাখবেন, চাইলে মৃত্যু দিবেন। আর পরকালেরও এবং ইহকালেরও পুরস্কার ও শাস্তি তাঁরই হাতে। শুধু এমন নয় যে, পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি (তাঁর হাতে); বরং এই পৃথিবীতেও যেসকল কাজ হয় সেগুলোর সিদ্ধান্তও খোদা তা'লার হাতে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন এতটা প্রশংসা করে তখন সে এই ধারণায় উপনীত হয় যে, খোদা কত মহান! যিনি রব, রহমান এবং রহীম। তাঁকে

অদৃশ্য হিসেবেই মেনে চলেছে, কিন্তু তাঁকে উপস্থিত জেনে (তাঁর কাছে) যাচনা করে। এ কথাগুলো তো অদৃশ্যের (বিষয়ে)। এরপর সে মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা যেন সামনেই আছেন; আর তাঁকে উপস্থিত জেনে কী আহ্বান করে? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি বা ইবাদত করতে চাই আর তোমারই কাছে এর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি। اِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ (আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত কর) যা সম্পূর্ণ সোজা, যাতে কোনো প্রকার বক্রতা নেই। এক পথ হয় অন্ধদের যাতে পরিশ্রম করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনো ফলাফল হস্তগত হয় না; আর আরেক পথ হলো সেটি যাতে পরিশ্রমের ফলে ফল আসে। এরপর বলা হয়েছে صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। আর সেটিই **'সিরাতে মুস্তাকীম'** যার ওপর চলার মাধ্যমে পুরস্কার লাভ হয়। এরপর বলা হয়েছে غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার শাস্তি এসেছে। وَلَا ٱلضَّآلِّينَ আর না তাদের পথ যারা পথ থেকে দূরে সরে গেছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, اِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ এর অর্থ হলো ইহজগত এবং ধর্মের সকল কাজের পথ। উদাহরণস্বরূপ এক চিকিৎসক যখন কারো চিকিৎসা করে তখন সে যদি একটি **'সিরাতে মুস্তাকীম'** না পায় তাহলে সে চিকিৎসা করতে পারে না। একইভাবে সমস্ত উকিল এবং সকল পেশা ও জ্ঞানের একটি সিরাতে মুস্তাকীম রয়েছে। সেটি লাভ হলে কাজ সহজেই সমাধা হয়ে যায়। তাই পার্থিব কাজকর্মেও সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান করা উচিত আর এটি তখনই হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকবে।

তিনি (আ.) যে বৈঠকে একথা বলছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি এই আপত্তি করে যে, নবীগণের এই দোয়া করার কী প্রয়োজন ছিল? এই দোয়া তো সাধারণ মানুষের জন্য; নবীদের এই দোয়া করার কী প্রয়োজন? মহানবী (সা.) এই দোয়া কেন করতেন? তাঁরা (অর্থাৎ নবীগণ) তো শুরু থেকেই সিরাতে মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (এর উত্তরে) বলেন,

তাঁরা এই দোয়া (তাঁদের আধ্যাত্মিক) মান ও মর্যাদার উন্নতির জন্য করেন। বরং এই اِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ দোয়া তো পরকালে মু'মিন বান্দারাও করবে, কেননা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কোনো সীমাপরিসীমা নেই, একইভাবে তাঁর (আধ্যাত্মিক) মর্যাদা ও মানের ক্ষেত্রে উন্নতিরও কোনো সীমা নেই।

সুতরাং এগুলো হলো সে সমস্ত শিষ্টাচার যা দৃষ্টিপটে রেখে নামায পড়লে, দোয়া করলে মানুষ এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয় যেখানে খোদা তা'লার নৈকট্য ও নিজের চাহিদাসমূহ উপস্থাপন করার সঠিক জ্ঞান লাভ হয়। এরপর দোয়া এবং এর রীতি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

দোয়া খুবই অদ্ভুত বিষয়। তবে আফসোসের বিষয় হলো দোয়া যাচনাকারীরাও দোয়ার রীতি সম্পর্কে অবগত নয় আর এযুগের দোয়াকারীরা সেসব রীতি সম্পর্কেও অবগত নয় যা দোয়া গৃহীত হওয়ার (জন্য আবশ্যক) হয়ে থাকে। বরং আসল কথা হলো, দোয়ার প্রকৃত মর্মই এখন মানুষ একেবারে বোঝে না। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা দোয়ায় আদৌ) বিশ্বাসী নয়, আর কিছু আছে দোয়ায় অবিশ্বাসী না হলেও তাদের বাস্তব অবস্থা এমন যে, দোয়ার রীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাদের দোয়া কবুল হয় না, কারণ প্রকৃত অর্থে তা

দোয়াই নয়; কারণ দোয়ার প্রকৃত যে মর্ম রয়েছে, সেই মানদণ্ডে তা দোয়া নয়– এই কারণে তাদের দোয়া কবুল হয় না, আর একই কারণে এমন মানুষ দোয়াতে অবিশ্বাসীদের চেয়েও অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের ব্যবহারিক অবস্থা অন্যদেরকে নাস্তিকতার নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। দোয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো, দোয়াকারী যেন কখনো ক্লান্ত হয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মন্দ ধারণা না করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন এই কুধারণা না করে যে, এখন (দোয়া করে) আর কিছুই হবে না। কখনো কখনো দেখা গেছে, এত পরিমাণে দোয়া করা হয়েছে যে, লক্ষ্যবস্তুর কলি যখন প্রস্ফুটিত হবার দ্বারপ্রান্তে তখনই দোয়াকারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যার ফলাফল হয় ব্যর্থতা ও অসফলতা। আর এই ব্যর্থতা এতটা মন্দ প্রভাব ফেলেছে যে, দোয়ার প্রভাবকেই অস্বীকার করা আরম্ভ হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিষয় এতদূর গড়ায় যে, এরপর তারা খোদা তা'লাকেই অস্বীকার করে বসে, নাস্তিকতা প্রাধান্য লাভ করে আর (তারা) বলে দেয় যে, যদি খোদা থাকতেন এবং তিনি যদি দোয়া কবুলকারী হতেন তাহলে এত দীর্ঘকাল যেসব দোয়া করা হয়েছে (সেগুলো) কেন গৃহীত হয় নি? কিন্তু এমন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি ও হোঁচট খাওয়া মানুষ যদি নিজের দৃঢ়তা না থাকা ও চঞ্চলতার কথা চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এই সমস্ত ব্যর্থতা তার নিজেরই তাড়াহুড়ো ও ত্বরাপরায়ণতার ফল। আজ এখানে তো কাল অন্যত্র; কোনো স্থিরতা নেই। তার প্রকৃতিতে তাড়াহুড়ো রয়েছে। অতএব এগুলো তো মানুষের নিজের ভুল। যদি অবিচলতা থাকে, তাড়াহুড়ো না থাকে এবং ঈমান দৃঢ় থাকে তবে কখনোই এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। যদি দোয়া গৃহীত না হয়ে থাকে তবে এটি হলো (তাদের) সেই তাড়াহুড়োর ফল; যাদের মাঝে খোদা তা'লার শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয়ে কুধারণা এবং ব্যর্থ করে দেয়া হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং (দোয়ার ক্ষেত্রে) কখনো ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়।

তিনি (আ.) পার্থিব উদাহরণের সাথে দোয়াকারীর ধৈর্যের উদাহরণ প্রদান করে বলেন, দেখ! দোয়ার উপমাও তেমনই যেভাবে একজন কৃষক বাইরে গিয়ে তার ক্ষেতে একটি বীজ বপন করে আসে। এখন বাহ্যত তো সে ভালো শস্যকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে কি কেউ একথা ভাবতে পারে যে, এই শস্যদানা এক সুন্দর বৃক্ষরূপে বেড়ে উঠে ফল দেবে? বাইরের জগৎ আর স্বয়ং কৃষকও দেখতে পায় না যে, এই শস্যদানা ভেতরে ভেতরে মাটির নীচে একটি চারাগাছে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অল্প কিছুদিন পর সেই শস্যদানা অঙ্কুরিত হয়ে ভেতরে ভেতরেই চারাগাছে পরিণত হতে থাকে এবং প্রস্তুত হতে থাকে। এভাবে এর পাতা ওপরে বেরিয়ে আসে। [বীজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমে এর শিকড় বের হয় এবং শিকড় মাটিতে প্রোথিত হয় আর এরপর কুঁড়ি বাইরে বের হতে শুরু হয়] এবং অন্য লোকেরাও এটি দেখতে পায়। এখন দেখ! সেই শস্যদানা যখন থেকে মাটির নীচে প্রোথিত করা হয়েছিল, মূলত তখন থেকেই সেটি চারাগাছে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছিল, কিন্তু বাহ্যিক চোখ সেটির কোনো খবর রাখে না। অথচ এখন যখন সেটির পাতা বাইরে বেরিয়ে এসেছে তখন সবাই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এক অবুঝ শিশু তখন এটি বুঝতে পারে না যে, সময়মতো এতে ফল ধরবে। চারা গজিয়েছে, এখন ফল ধরার পর্ব বাকি রয়েছে। [অবুঝ শিশু মনে করবে, এতে তো ফল ধরবে না, কারণ এটি ছোট। সে চায়, এখনই কেন এতে ফল ধরে না। কিন্তু বিচক্ষণ কৃষক খুব ভালোভাবে জানে, এর ফল ধরার সময় কোনটি।] সে ধৈর্যের সাথে এটির দেখাশুনা করে এবং মনোযোগ দিয়ে

পরিচর্যা করতে থাকে আর এভাবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে যায় যখন তাতে ফল ধরে এবং তা পেকেও যায়। দোয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য আর ঠিক এভাবেই পরিণত হয়ে ফলদার বৃক্ষে রূপ নেয়। ত্বরাপরায়ণ প্রথমেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে, কিন্তু পরিণামদর্শী ধৈর্যধারণকারীরা অবিচলতার সাথে দোয়া করতে থাকে। (যারা দূরদর্শী এবং ধৈর্য ধরে পরিণাম অবলোকন করে, তারা অবিচলতার সাথে নিজেদের কাজে লেগে থাকে এবং দোয়ায় রত থাকে আর অবশেষে নিজ লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়।]

এরপর দোয়াকারীদের ধৈর্যের মান (কীরূপ হয়)– এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, একথা সত্য যে, দোয়ার মাঝে বড় বড় ধাপ ও স্তর রয়েছে যেগুলো না জানার কারণে দোয়াকারীরা নিজে থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়। তাদের তাড়াহুড়ো লেগে যায় আর তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, অথচ আল্লাহ্ তা'লার কাজে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। দেখ! এমনটি কখনো হয় না যে, আজ মানুষ বিয়ে করলে আগামীকালই তার ঘরে সন্তান জন্ম নেবে; অথচ তিনি (আল্লাহ্) সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। কিন্তু যে বিধান এবং নেযাম বা ব্যবস্থাপনা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আবশ্যিক। প্রথমে তরুলতার বেড়ে ওঠার ন্যায় কিছু বুঝা যায় না। [চারাগাছ যেভাবে বেড়ে ওঠে প্রথমে তো এর কিছুই বুঝা যায় না। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির জন্মের সময় (প্রথমে বুঝাই যায় না)। এখন মানুষের উপমার ক্ষেত্রে চার মাস পর্যন্ত কেউ নিশ্চিতভাবে বলতেই পারে না। এরপর কিছুটা নড়াচড়া অনুভূত হয় আর পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রান্ত করে অনেক বড় কষ্ট সহ্য করার পর সন্তান জন্ম নেয়। (ডাক্তারও এখন বারো সপ্তাহর পরই আল্ট্রাসাউন্ড করে কিছু বলতে পারে। সবধরনের আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও সন্তানের জন্ম হওয়ার বিষয়ে ডাক্তাররা যখন সঠিকভাবে জানতে পারে আর যখন আল্ট্রাসাউন্ড করে তখন বারো সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সেই যুগে যখন তিনি বর্ণনা করছেন তখন এত উন্নত প্রযুক্তি ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।) তিনি (আ.) বলেন, বাচ্চার জন্ম নেয়ার সাথে মায়েরও নবজন্ম হয়। (শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এমন নয় যে, সহজেই জন্ম হয়ে যায়; বরং মাকেও নতুনভাবে জন্ম নিতে হয়।) তিনি (আ.) বলেন, পুরুষ হয়তো সেই দুঃখকষ্ট অনুমান করতে পারে না যা গর্ভকালীন সময়ে নারীকে সহ্য করতে হয়, কিন্তু একথা সত্য যে, নারীও একটি নতুন জীবন লাভ করে। এখন গভীরভাবে প্রণিধান কর, সন্তানের জন্য প্রথমে তার নিজেকে একটি মৃত্যু বরণ করতে হয় আর এরপর গিয়ে সে আনন্দ লাভ করে। একইভাবে দোয়াকারীর জন্য আবশ্যক বিষয় হলো, চঞ্চলতা ও ত্বরা পরিহার করে সকল দুঃখকষ্ট যেন সহ্য করতে থাকে, (তাড়াহুড়ো না করে, বরং দুঃখকষ্ট সহ্য করে এবং অনবরত দোয়া করতে থাকে।) আর কখনোই এমন ধারণা না করে যে, দোয়া কুবল হয় নি। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে যায়। দোয়ার ফলাফল সৃষ্টি হওয়ার সময় এসে যায় যখন কাঙ্ক্ষিত সন্তান জন্ম নেয়। দোয়ার জন্য প্রথম আবশ্যক বিষয় হলো একে এমন স্থান ও মানে উপনীত করা যেখানে পৌঁছে তা ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়। (দোয়াকে প্রথমে এই মানে উপনীত করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে আতশকাচের নীচে কাপড় রাখলে সূর্যের কিরণ বা রশ্মি এসে সেই কাচের ওপর পড়ে আর তখন এর তাপ ও উত্তাপ এমন স্তরে পৌঁছে যায় যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দেয়, ফলে সহসাই সেই কাপড় জ্বলে ওঠে। অনুরূপভাবে আবশ্যিক বিষয় হলো, দোয়া যেন এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে তার

মাঝে সে শক্তি সৃষ্টি হবে যা অসফলতাকে জ্বালিয়ে দেবে এবং উদ্দেশ্য পূরণকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

অতএব প্রত্যেক দোয়াকারী আত্মবিশ্লেষণ করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে এই মানে উপনীত হয়েছে কি না? তিনি (আ.) ফার্সি একটি পঙক্তির মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বলেন,

پیدا است نگارا کہ بلند است جَنابت

অর্থাৎ ডাক থেকেই বুঝা যায় তোমার দরবার অনেক উচ্চ।

একথা আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে। তিনি (আ.) বলেন, এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষকে দোয়ায় রত থাকতে হয়। অবশেষে খোদা তা'লা (কবুলিয়্যতের লক্ষণ) প্রকাশ করে দেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের অভিজ্ঞতাও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো বিষয়ে যদি তিনি দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বন করেন তবে সফলতার আশা থাকে; আশা জন্মে, যেহেতু দোয়া করার আরো সুযোগ পাচ্ছে, তাই আল্লাহ্ তা'লা সফলতা দান করবেন। কিন্তু যে বিষয়ে দ্রুত উত্তর পাওয়া যায় আর উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে সেই কাজ আর হবার নয়। তিনি (আ.) বলেন, সাধারণত জগতে আমরা দেখি, একজন ভিখারি যখন কারো দরজায় যাচনা করতে যায় তখন অত্যন্ত কাকুতিমিনতি ও বিনয়ের সাথে যাচনা করে এবং কিছুক্ষণ বকাঝকা খেয়েও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ে না। (বাড়িওয়ালা তাকে বকাঝকা করে কিন্তু সে তার অবস্থান থেকে সরে না) এবং চাইতেই থাকে। পরিশেষে সে, অর্থাৎ বাড়িওয়ালা কিছুটা লজ্জায় পড়ে যায়; যতই কৃপণ হোক না কেন তারপরও ভিখারিকে কিছু না কিছু দিয়েই দেয়! তাহলে কি একজন দোয়াকারীর মাঝে এক সাধারণ ভিখারির মতো দৃঢ়তাও থাকা উচিত নয়? খোদা তা'লা যিনি দয়ালু এবং লজ্জাশীল, তিনি যখন দেখেন তাঁর দুর্বল বান্দা এক দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দরবারে লুটিয়ে রয়েছে তখন কখনোই তার পরিণাম অশুভ করেন না। যেমন– একজন গর্ভবতী মহিলা যদি চার-পাঁচ মাস পর বলে, 'এখনো বাচ্চা কেন হচ্ছে না?' এবং এই বাসনায় সে যদি কোনো গর্ভপাতের ঔষধ সেবন করে নেয় তাহলে তখন কেমন করে বাচ্চা জন্ম নেবে? বাচ্চা তো নষ্টই হয়ে যাবে অথবা সে নিজেই একটি হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিপতিত হবে। একইভাবে যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বেই তাড়াহুড়া করে সে ক্ষতিরই সম্মুখীন হয়। আর কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হয় না বরং ঈমানেও আঘাত লাগে। এমন অবস্থায় অনেকে নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের গ্রামে একজন কাঠমিস্ত্রি ছিল এবং তার স্ত্রী অসুস্থ হয় এবং পরে সে মারা যায়। ফলে সে বলে, যদি খোদা বলে কোনো অস্তিত্ব থাকত তাহলে আমি যে এত দোয়া করেছিলাম তা কবুল হয়ে যেত আর আমার স্ত্রী মারা যেত না। এভাবে সে নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, সৌভাগ্যবান লোক যদি নিজের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তবে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং সব কার্যও সমাধা হয়ে যায়। খোদার মোকাবিলায় জাগতিক ধনসম্পদ কী গুরুত্ব রাখে? তিনি এক নিমিষেই সবকিছু করতে পারেন। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা কি দেখ নি, তিনি সেই জাতিকে বাদশাহ্ বানিয়ে দিয়েছেন যাদের কেউ চিনতোই না। আরবের বেদুইনরা কী ছিল! তারা কেমন মানুষ ছিল! অথচ তারাই পৃথিবী শাসন করেছে আর (আল্লাহ্) বড় বড় সাম্রাজ্যকে তাদের অধীন করে দিয়েছেন। ক্রীতদাসদের বাদশাহ্ বানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি খোদাভীতি অবলম্বন করে এবং একান্তই আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিবেদিত হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে উচ্চমানের জীবন লাভ হবে, কিন্তু শর্ত হলো, সত্যবাদী এবং সুপুরুষ হয়ে দেখাতে

হবে। হৃদয় দোদুল্যমান যেন না হয় এবং এর মাঝে যেন কোনোরূপ মলিনতা, লৌকিকতা ও অংশীবাদিতার সংমিশ্রণ না থাকে। ইব্রাহীম (আ.)-এর মাঝে এমন কী গুণাবলী ছিল যার কারণে তাঁকে জাতির পিতা এবং একত্ববাদীদের পিতা আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে অগণিত মহান কল্যাণে ভূষিত করেছেন? এর একমাত্র কারণ ছিল (তাঁর) সততা ও নিষ্ঠা। দেখ! হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি দোয়া করেছিলেন। আর সেই দোয়া ছিল, তাঁর বংশধরদের মধ্যে থেকে যেন আরবে একজন নবী আবির্ভূত হন। সেই দোয়া কি সাথে সাথেই কবুল হয়েছিল? ইব্রাহীমের (আ.) পর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত কারো মনেই পড়ে নি যে, এই দোয়ার কী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সেই দোয়া কবুল হয় আর কতই না মহান মর্যাদার সাথে তা কবুল হয়!

অতএব যেভাবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন কেবল কষ্টের সময় দোয়া না করে, বরং আল্লাহ্ তা'লা যখন সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেন তখনও দোয়া করা অব্যাহত রাখা উচিত।

দোয়া কবুলের জন্য দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক এবং কেমন সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক তা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বাহ্যিক বা দৈহিক নামায ও রোযার সাথে যদি নিষ্ঠা ও সততা না থাকে তাহলে (এমন ইবাদত) নিজের মাঝে কোন বিশেষত্ব রাখে না। এলাম, নামায পড়লাম কিন্তু হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হলো না– তাহলে (এমন নামাযে) কোনো লাভ নেই। যোগী এবং সন্ন্যাসীরাও নিজ নিজ অবস্থানে অনেক কষ্টসাধনা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ নিজেদের হাত শুকিয়ে ফেলে। হাত উঠিয়ে রাখে আর টানা কয়েকদিন উঠিয়ে রাখে যার ফলে হাত শুকিয়ে যায়। অনেক শারীরিক কষ্ট সহ্য করে এবং নিজেকে অনেক বড় বড় কষ্ট এবং বিপদে নিপতিত করে। কিন্তু এসব কষ্ট তাদেরকে কোনো জ্যোতি দান করতে পারে না এবং তারা কোনো প্রশান্তি ও স্বস্তিও লাভ করে না। বরং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। তারা শারীরিক কসরত করে ঠিকই যার সাথে হৃদয়ের খুব সামান্যই সম্পর্ক থাকে। যার ফলে তাদের আধ্যাত্মিকতায় কোনো প্রভাব পড়ে না। বাহ্যিকভাবে কেরামতি দেখাতে পারে কিংবা চেষ্টাসাধনাও করে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুধার্তও থাকে, বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আদর্শ তারা দেখাতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেন,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ

অর্থাৎ তোমাদের কুরবানীর মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না, বরং তোমাদের তাকওয়া পৌঁছায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা বাকল পছন্দ করেন না বরং তিনি মগজ বা মূল বিষয় চান। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি মাংস এবং রক্ত না পৌঁছায় বরং তাকওয়া পৌঁছায় তাহলে কুরবানী করার আবশ্যকতা কী? একইভাবে নামায, রোযা যদি আত্মিক বিষয়ই হয়ে থাকে তাহলে বাহ্যিকতার কী প্রয়োজন? বসে বসে মনে মনেই নামায পড়ে নিলাম, দোয়া করলাম, কান্নাকাটি করলাম, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যাচনা করলাম যেমনটি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে (ইবাদাতের রীতি) ছিল। নামাযের বিভিন্ন অবস্থা, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু, সিজদা– এগুলোর কী প্রয়োজন?

তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, এটি একেবারে প্রমাণিত সত্য যে, যারা শরীরকে কাজে লাগানো পরিত্যাগ করে তাদের আত্মা তা মেনে নেয় না। এছাড়া তাদের মাঝে সেই বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে পারে না যা মূল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি কেবল দেহকে কাজে লাগায়

কিন্তু আত্মাকে এতে সম্পৃক্ত করে না, সে ভয়ানক ভ্রান্তিতে নিপতিত আর এই যোগীরা এমনই হয়ে থাকে। তারা নিজের দেহকে কাজে লাগায় ঠিকই কিন্তু আত্মার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা আত্মা ও দেহের পরস্পরের মাঝে একটি সম্পর্ক রেখেছেন আর দেহের প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কৃত্রিমভাবে কান্না করতে চায় তাহলে একসময় তার কান্না এসেই যাবে, আর একইভাবে যে কৃত্রিমভাবে হাসতে চাইবে অবশেষে তার হাসি চলেই আসবে। অনুরূপভাবে নামাযে দেহ যে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, যেমন দাঁড়ানো বা রুকু করা– এসব অবস্থায় একইসাথে আত্মার ওপরও প্রভাব পড়ে। আর দেহের মাঝে যেরূপ বিনীত ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে অনুরূপ (অবস্থা) আত্মাতেও সৃষ্টি হবে। বিনয় ও নম্রতা দেহে যেমন থাকে আত্মাতেও তেমনই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মোটকথা নিছক সিজদা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না। যদি নিছক সিজদা করে আর এতে কোনো বিনয়, নম্রতা ও সমর্পণ না থাকে, অর্থাৎ আত্মাও সমভাবে সঙ্গ না দেয়– তাহলে নিছক সিজদা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না। কিন্তু সিজদার সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক রয়েছে, এজন্য সিজদা হলো নামাযের চূড়ান্ত মার্গ। মানুষ যখন বিনয়ের চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হয় তখন সে সিজদাই করতে চায়। প্রকৃতিগতভাবেই সে পরম বিনয়ের অবস্থা প্রদর্শন করতে চায়, ঝুঁকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, এমনকি পশুর মাঝেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কুকুরও যখন তার মনিবকে ভালোবাসে তখন কাছে এসে মনিবের পায়ে নিজ মাথা রেখে দেয় এবং সিজদা আকারে আপন ভালোবাসার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে। এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, দেহের সাথে আত্মার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে আত্মার বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবও দেহে প্রকাশিত হয়। আত্মা যখন দুঃখভারাক্রান্ত হয় তখন দেহেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অশ্রু ও মালিন্যভাব প্রকাশিত হয়, শরীর নিস্তেজ ও নির্জীব লাগে। যদি আত্মায় দুঃখ থাকে, কোনো মানুষের মনে যদি কষ্ট থাকে তাহলে দেহকেও ক্লান্তশ্রান্ত দেখা যায়, শরীর নিস্তেজ ও মনমরা থাকে আর তার কী অবস্থা হয়েছে তা অন্যদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায়। কোনো সভায় তার বসতে মন চায় না। কোনো বৈঠকে বসলে সবাই জিজ্ঞেস করতে থাকে, কী হয়েছে? তিনি (আ.) বলেন, যদি আত্মা ও দেহের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক না থাকত তাহলে এমন কেন হয়? রক্ত সংঞ্চালনও হৃদপিণ্ডের অন্যতম কাজ, কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই, হৃদপিণ্ড দেহ সিঞ্চিত রাখার জন্য ইঞ্জিনের ভূমিকা পালন করে। রক্ত সঞ্চালিত হয় হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে কিন্তু হৃদপিণ্ড একটি ইঞ্জিন হিসাবে চলছে। এর সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই সবকিছু হয়, হৃদপিণ্ডের পাম্পের মাধ্যমেই সবকিছু হয়। মোটকথা, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় ধারা সমান্তরালে চলে। হৃদপিণ্ড কখনো সম্প্রসারিত হয় আবার কখনো সংকুচিত হয়, আর এটিই দৈহিক পুরো ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করে, এর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনও হয়। তিনি (আ.) বলেন, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা এভাবেই সমভাবে পরিচালিত হয়। আত্মায় যখন বিনয় সৃষ্টি হয় তখন দেহেও তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য আত্মায় যখন সত্যিই বিনয় ও আনুগত্য থাকে তখন দেহে এর প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, আর একইভাবে অন্য কোনো প্রভাব যদি দেহে পড়ে সেক্ষেত্রে আত্মাও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার সকাশে যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন দৃঢ় প্রত্যয় ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ করা আবশ্যক। যদিও এ সময় বাহ্যত এটি এক ধরনের কপটতা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মন না চাইলেও জোরপূর্বক বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো তো একধরনের নিফাক বা কপটতাই বটে, কিন্তু এরপরও করতে হবে।

কেননা ধীরে ধীরে এই প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয় আর এরপর আত্মা ও দেহ উভয়ে একযোগে কাজ করা আরম্ভ করে। তিনি (আ.) বলেন, আর আসলেই আত্মার মাঝে সেই বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে আর এ অবস্থা যখন সৃষ্টি হওয়া শুরু হয় তখন মানুষ নামাযে স্বাদও পেতে থাকে। সে কেবল নিজের মতলবের জন্য খোদা তা'লার সমীপে উপস্থিত হয় না বরং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসার খাতিরে নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়।

এরপর আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "কিছু লোক বলে আমরা নামাযে স্বাদ পাই না। কিন্তু তারা জানে না স্বাদ লাভ করা নিজ ইচ্ছাধীন নয়। আর স্বাদের মানদণ্ডও ভিন্ন। এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি চরম কষ্টে নিপতিত থাকে কিন্তু সে এই কষ্টকেও স্বাদই মনে করে নেয়। তিনি (আ.) যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন ট্রান্সিলভানিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল। তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি (আ.) বলেন, "ট্রান্সিলভানিয়ায় যে মানুষ যুদ্ধ করছে যদিও এতে প্রাণ যায় এবং নারীরা বিধবা ও শিশুরা এতিম হয়, কিন্তু জাতির প্রতি আত্মাভিমান ও এর সুরক্ষার বিষয়টি তাদের এক স্বাদ ও আনন্দের সাথে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করছে। তাদের জাতির প্রতি আত্মাভিমান ও এর প্রতিরক্ষা আনন্দের সাথে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে জাতি তাদের পরিশ্রম ও জীবন উৎসর্গের মূল্যায়ন করছে। যেখানে জাতীয় স্বার্থ (সবার কাছে) অভিন্ন। উদ্দেশ্য তো একই। একাংশ ত্যাগ স্বীকার করছে আর অন্যরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে, তাদের মূল্যায়ন করছে। তাহলে তাদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন কেন করা হয়? তাদের দুঃখ ও কষ্টের কারণে। যেহেতু তারা কষ্ট সহ্য করছে তাই তাদের মূল্যায়ন করা হয়। তাদের পরিশ্রম ও প্রাণ উৎসর্গের কারণে তাদের মূল্যায়ন করা হয়। তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করছে। মোটকথা, সকল স্বাদ ও প্রশান্তি দুঃখের পর আসে। এজন্যই পবিত্র কুরআন এই নীতি বলেছে, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (সূরা ইনশিরাহ: ৭)। যদি কোনো প্রশান্তির পূর্বে কষ্ট না থাকে তাহলে সেই প্রশান্তি কোনো প্রশান্তিই নয়। তেমনিভাবে যারা বলে, 'ইবাদতে আমরা স্বাদ পাই না', তাদের প্রথমে নিজেদের অবস্থান থেকে চিন্তা করা উচিত যে, তারা ইবাদতের জন্য কতটুকু দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করছেন। যদি স্বাদ না পায় তাহলে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত, তারা ইবাদতের জন্য কি কোনো কষ্ট সহ্য করেছেন? মানুষ যত দুঃখকষ্ট সহ্য করবে সেটাই দৃশ্যপট পরিবর্তনের পর স্বাদে পরিণত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমার বলার অর্থ সেসব কষ্ট নয় যা মানুষ নিজেকে অনর্থক কষ্টে নিপতিত করে এবং অসহনীয় কষ্ট সহ্য করার দাবি করে। বরং আমার বলার অর্থ হলো, মানুষ যেন সময়মতো নামাযগুলো পড়ার জন্য এর সকল শর্ত ও অনুষঙ্গসহ পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আদায় করার চেষ্টা করে। এছাড়া নিজেদের ঘুমও বিসর্জন দেয় এবং নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ত্যাগ স্বীকার করে সময়মতো নামায আদায় করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় যেন হৃদয়ে সৃষ্টি করে। কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজেরা কোনো প্রকার কষ্ট সহ্য করে না অথবা সহ্য করতে চায় না আর মনে করে, অন্যদের দ্বারা দোয়া করিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে অনেক সময় উত্তর থেকে জানা যায়, পাঁচ বেলার নামাযও নিয়মিত পড়ে না। একবার এক পুত্র নিজ পিতার ব্যাপারে দোয়া করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দোয়ার উদ্দেশ্যে বলে, আর এই দোয়া কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য ছিল না বরং তার ধর্মের ব্যাপারে ছিল। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মনোযোগ সহকারে তুমি দোয়া কর; তুমি নিজে

মনোযোগ সহকারে দোয়া কর। পিতার দোয়া যেমন পুত্রের জন্য কবুল হয় একইভাবে পুত্রের দোয়াও পিতার পক্ষে কবুল হয়। সে ব্যক্তিকে তিনি (আ.) বলেন, আপনিও যদি মনোযোগ দিয়ে দোয়া করেন তাহলে তখন আমার দোয়ারও প্রভাব পড়বে। নিজে দোয়া করবে তাহলে আমার দোয়ারও প্রভাব পড়বে, নতুবা কিছুই হবে না। সুতরাং দোয়ার যারা আবেদন করেন তারা কেবল অন্যদের দোয়ার ওপরই নির্ভর করবেন না, বরং নিজেও মনোযোগ দিয়ে দোয়া করবেন।

ইবাদতে স্বাদ লাভের পদ্ধতির ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, স্মরণ রেখ, মানুষ যখন খোদা তা'লার খাতিরে নিজের প্রিয় বিষয়াদি যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এবং তাঁর অভিপ্রায়ের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো পরিত্যাগ করে নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে, তখন যে দেহ এরূপ কষ্ট সহ্য করেছে তার প্রভাব আত্মার ওপরও পড়ে। কী ধরনের কষ্ট? (ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল, কষ্ট স্বীকার করা উচিত; তা কী ধরনের কষ্ট?) অপছন্দীয় বিষয়াদি যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরোধী সেগুলো পরিত্যাগ কর। সেগুলো পরিত্যাগ করতে যদি কষ্টও হয় তবুও সেগুলো পরিত্যাগ কর। যে দেহ এরূপ কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করে তার আত্মার ওপরও এর সুপ্রভাব পড়ে এবং সেই (আত্মা)ও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একইসাথে নিজের ভেতর পরিবর্তন করতে শুরু করে, এমনকি পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে অবলীলায় মহান স্রষ্টার দরবারে লুটিয়ে পড়ে। (এভাবে যখন কষ্ট সহ্য করবে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কিছু বিষয় পরিত্যাগ করবে তখন আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়বে। আর যখন আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়বে তখন সেই আত্মা নামায, সিজদা, রুকু প্রভৃতিতে আল্লাহ্‌র সমীপে লুটিয়ে পড়বে। এটি হলো ইবাদতে স্বাদ লাভ করার পদ্ধতি।) তিনি (আ.) বলেন, তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা ইবাদতে স্বাদ লাভের উপায় বলতে এটিকেই মনে করে যে, কিছু গান গেয়ে নিল বা বাদ্যযন্ত্র বাজাল আর এটিকেই তার ইবাদত বলে মনে করে। (চোখ বুজে মুরাকাবা, অর্থাৎ ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যায় আর মনে করে, এটিই ইবাদত হয়ে গেছে! কিংবা গান শুনে মনে করে এতেই ইবাদত হয়ে গেছে।) তিনি (আ.) বলেন, এতে ধোঁকা খেয়ো না! এসব বিষয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায় গণ্য হতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাদ লাভের কোনো বিষয় এগুলোতে নেই। এগুলোর মাধ্যমে আত্মার মাঝে নম্রতা ও বিনয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না এবং ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, নর্তকীদের আসরেও একজন মানুষ এরূপ আনন্দ লাভ করে থাকে; তবে কি তা ইবাদতের স্বাদ বলে গণ্য হয়? এটি সূক্ষ্ম বিষয় যা অন্যান্য জাতি বুঝতেও অক্ষম, কেননা তারা ইবাদতের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতেই পারে নি।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা এবং খোদা তা'লার খাতিরে স্বহস্তে নিজেকে কষ্টের মাঝে নিপতিত করা ও এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের উপমা দিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের পথ হলো, তাঁর জন্য সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করা। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে নৈকট্য অর্জন করেছেন তা একারণেই করেছিলেন। বস্তুত (আল্লাহ্) বলেন, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ (সূরা নজম: ৩৮) অর্থাৎ ইব্রাহীম হলো সেই ব্যক্তি যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে। খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা, সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন এক মৃত্যু চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পৃথিবী ও এর যাবতীয় কামনা বাসনা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত না হবে এবং সব রকম লাঞ্ছনা, কষ্ট ও কাঠিন্য খোদার খাতিরে সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে– এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের কোনো গাছ বা পাথরকে পূজা করাটাই

কেবল মূর্তিপূজা নয়, বরং প্রত্যেক এমন বস্তু যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে বাধা দেয় ও সেটির তুলনায় অগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়ায় তা-ও প্রতিমা। মানুষ নিজের ভেতর এত বেশি প্রতিমা ধারণ করে রাখে যে, সে জানেও না যে, 'আমি মূর্তিপূজা করছি'। বস্তুত যতক্ষণ কেউ একান্তই খোদা তা'লার হয়ে না যায় এবং তাঁর পথে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন। ইব্রাহীম (আ.) যে এই উপাধি পেয়েছেন, তা কি এমনিই পেয়েছিলেন? না! إِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ (সূরা নজমঃ ৩৮) ধ্বনি তখন উচ্চারিত হয়েছে যখন তিনি নিজ পুত্রকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা কর্ম দেখতে চান এবং কর্মের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট হন, আর কর্ম কষ্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা তাকে দুঃখেও নিপতিত করেন না। দেখ! ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালনার্থে স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পুত্রকে রক্ষা করেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন কিন্তু আগুন তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে খোদা তা'লা দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করেন। আমাদের হাতে দেহ আছে কিন্তু রূহ বা আত্মা নেই। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের হাতে দেহ আছে কিন্তু রূহ বা আত্মা নেই। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক রয়েছে, আর দৈহিক বিষয়াদির প্রভাব আত্মার ওপর অবশ্যই পড়ে। এজন্য কখনোই মনে করা উচিত নয় যে, আত্মার ওপর দেহের কোনো প্রভাব পড়ে না। মানুষ যেসব কাজ করে তা এই সমন্বিতরূপেই হয়ে থাকে, অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়ের মিলনের ফলে হয়। পৃথক দেহ কিংবা একা আত্মা কোনো ভালো বা খারাপ কাজ করে না। এজন্য পুরস্কার বা শাস্তির ক্ষেত্রেও উভয়ের সম্পর্কের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো মানুষ এ রহস্যটি না বুঝার কারণেই আপত্তি করে বসে (আর বলে,) মুসলমানদের জান্নাত বস্তুগত। অথচ তারা এতটুকু বুঝে না যে, আমল করার ক্ষেত্রে যখন দেহ সাথে ছিল তখন প্রতিদান দেয়ার সময় কেন পৃথক করা হবে? মোটকথা, কঠিন বা সহজ এ দুই পথই পরিত্যাগ করে ইসলাম এর মাঝামাঝি পথ বাতলে দিয়েছে। এদুটোই ভয়ঙ্কর বিষয়, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। শুধুমাত্র দৈহিক কষ্ট ভোগে কিছুই লাভ হয় না, আবার কেবল আরাম করেও কোনো ফলাফল সৃষ্টি হয় না। দেহকে কষ্টে নিপতিত করেও কোনো লাভ হয় না, আর কেবল আরাম করলেও কোনো উপকার হবে না। আত্মা ও শরীরের সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক।

দোয়া করার সময়ও পরীক্ষা এসে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর জাতির ওপর কীভাবে পরীক্ষা এসেছে এবং (তা কীভাবে) দীর্ঘ হয়েছে– এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন,

প্রতিটি কাজের জন্য একটি (নির্ধারিত) সময় থাকে আর সৌভাগ্যবান লোক এর অপেক্ষা করে। কিন্তু যারা অপেক্ষা করে না এবং চোখের পলকে এর ফলাফল লাভের আশা করে তারা ত্বরাপ্রবণ হয়ে থাকে আর তারা সফলকাম হতে পারে না। আমার মতে এটিও সম্ভব এবং হয়েও থাকে যে, দোয়া করার সময় পরীক্ষারূপে আরো পরীক্ষা আসে। যেমন– হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আসেন তখন ফেরাউন তাদেরকে প্রথমে মিশরে যে কাজটি দিয়েছিল তা হলো অর্ধদিবস তারা ইট বানাবে আর বাকি অর্ধদিবস নিজেদের কাজ করবে। তাদের অর্ধদিবসের ছুটি ছিল আর

অর্ধদিবস ফেরাউনের কাজ করতে হতো। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে দুষ্টদের পক্ষ থেকে দুষ্টামি করে বনী ইসরাঈলের কাজ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। শাস্তিস্বরূপ কী হয়? তাদের নির্দেশ দেয়া হয়, অর্ধদিবস তোমরা ইট বানাবে আর অর্ধদিবস ঘাস নিয়ে আসবে, সেটিও ফেরাউনেরই কাজ হবে। তাদের কাছে নিজেদের জন্য কোনো সময় ছিল না। এ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে তা অবগত করেন তখন তারা, অর্থাৎ তাঁর জাতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, হে মূসা! খোদা আপনাকেও সেই কষ্ট দিন যা আমরা পেয়েছি। তারা মূসা (আ.)-কে আরো বদদোয়া দেয়। অথচ মূসা (আ.) তাদেরকে কেবল একথাই বলেন যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। তওরাতে এসব ঘটনা লেখা রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যতই তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন ততই তারা আরো উত্তেজিত হতো। অর্থাৎ আরো বেশি রাগান্বিত হতো। অবশেষে যা হয় তা হলো মিশর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, অর্থাৎ সেখান থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত হয় আর মিশরবাসীর যে সমস্ত কাপড়, বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়েছিল তা তারা সাথে নিয়ে নেয়। যা কিছু তারা পেয়েছিল সেগুলোও সাথে নিয়ে নিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন (তাঁর) জাতিকে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসেন তখন ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। বনী ইসরাঈল যখন দেখে ফেরাউনের সেনাবাহিনী তাদের কাছাকাছি (পৌঁছে গেছে) তখন তারা খুব অস্থির হয়ে যায়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে লিখা রয়েছে, তখন তারা চিৎকার করে বলে, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ অর্থাৎ হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু মূসা (আ.) যিনি নবীর চোখে পরিণতি দেখছিলেন, তিনি তাদেরকে কেবল এটিই উত্তর দেন যে, كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, অর্থাৎ কক্ষনো নয়, আমার প্রভু আমার সাথে আছেন। তওরাতে লেখা রয়েছে, তারা আরো বলে, মিশরে কি আমাদের জন্য কবর ছিল না? এই অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, পেছনে ফেরাউনের সেনাবাহিনী আর সামনের দিকে ছিল নীল নদ। তারা বলছিল, আমরা যদি মিশরেই থাকতাম তবে সেখানেও মরতে হতো (আর) সেখানেই দাফন হয়ে যেতাম। তারা তো ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল, কেননা সামনে (নীল) নদ আর পেছন দিকে রয়েছে সেনাবাহিনী যারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে। (তারা) ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি (আ.) বলেন, তারা দেখছিল, তারা পিছনে গিয়েও বাঁচতে পারবে না আর সামনে এগিয়েও না। কিন্তু মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশীল সর্বশক্তিমান খোদা। নীল নদের মধ্যে দিয়ে তারা রাস্তা পেয়ে যায় এবং গোটা বনী ইসরাঈল জাতি নিশ্চিন্তে (নীল নদ) পার হয়ে যায়, কিন্তু ফেরাউনের সেনাদল (নীল নদে) ডুবে মরে। এহেন পরিস্থিতে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন যা একটি মহান মু'জিযা ছিল আর মুত্তাকীর সাথে এমনটিই হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক দুঃখকষ্ট থেকে সে মুক্তির পথ পায়। يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا তিনি তার জন্য নিষ্কৃতির কোন পথ তৈরি করে দিয়ে থাকেন} ।

"মোটকথা দোয়া এবং এর কবুল হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো পরীক্ষার পর পরীক্ষা আপতিত হয় আর এমন কঠিন পরীক্ষাও আপতিত হয় যা কোমর ভেঙ্গে দেয়ার মতো হয়। কিন্তু অবিচল ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী সৎ প্রকৃতির মানুষ এসব পরীক্ষা এবং কষ্টের মাঝেও নিজ প্রভুর নানাবিধ অনুগ্রহের সৌরভ লাভ করে এবং বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখে যে, এরপর সাহায্য আসতে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষা আসার পেছনে একটি রহস্য হলো, এতে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস হৃদয়ে দানা বাঁধে। কেননা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা যত

বেশি বৃদ্ধি পাবে হৃদয় ততই বিগলিত হবে, আর এটি হলো দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণগুলোর একটি।" বিগলন, আহাজারি ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া এ বিষয়ের প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করতে চান। "কাজেই, মনোবল হারানো উচিত নয় আর অধৈর্য এবং ব্যাকুলতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। আমার দোয়া কবুল হবে না বা হয় না এমন ধারণা কখনোই করা ঠিক নয়।" তিনি (আ.) বলেন, "এমন ধারণা করার ফলে আল্লাহ্ তা'লার এই গুণের অস্বীকার করা হয়ে যায় যে, তিনি দোয়া কবুলকারী।" **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে (মানুষ) নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়। এছাড়া যেভাবে আমি বলেছি, বর্তমানে ধর্ম এবং খোদা তা'লার বিরুদ্ধবাদীদের মনোযোগ কেবল এই দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে যে, (মানুষের) হৃদয়ে যেন 'খোদা তা'লা তোমাদের কী দিয়েছেন, ধর্মের উপকারীতা কী?'– এ চিন্তাধারার উদ্রেক ঘটানো যায়। ধর্ম (মানুষকে) অলস বানিয়ে দেয়, ধর্ম (মানুষের) মস্তিষ্কে মনগড়া বিষয় সৃষ্টি করে। এমন অবস্থায় প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা। (কেবল) সাময়িক কিংবা প্রয়োজনের সময়ই যেন (আল্লাহ্ তা'লার সাথে) সম্পর্ক রাখা না হয় এবং ইবাদত করা না হয়, বরং শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায়ও যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক অটুট থাকে এবং নিজেদের ইবাদত সুরক্ষা করা হয় আর দোয়া (কবুলিয়্যতের) বিষয়ে যেন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এই হলো একজন আহমদীর দায়িত্ব আর এরই নাম বয়আতের দাবি পূরণ করা। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হলো, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায় এবং খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় আর পুণ্যকর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন সৃষ্টি না হয়। কেননা শিথিলতা সৃষ্টি হলে ওযু করাকেও একটি আপদ মনে হয়, তাহাজ্জুদ নামায তো অনেক পরের বিষয়।" তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়া অনেক বড় বিষয়, সাধারণ (পাঁচ বেলার) নামায পড়াই কঠিন মনে হয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা না থাকে, (অর্থাৎ তোমার মাঝে যদি পুণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনা না থাকে) তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১০-৭১১, নব সংস্করণ)**

অতএব গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করতে হবে। আর যখন এই সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে তখন দোয়ার কবুলিয়্যতের দৃশ্যও আমরা অবলোকন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এরও তৌফিক দান করুন।

এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন; সেখানে আহমদীদের জন্য অনেক বেশি সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন; সেখানেও আজকাল আবার তাদের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা সমস্যা সৃষ্টি করছে। একইভাবে অন্যান্য স্থানেও যেখানে যেখানে আহমদীরা সমস্যায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক আহমদীকে নিরাপদে রাখুন এবং সকল প্রকার উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করুন আর শত্রুদের বিফল ও নিরাশ করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)